বসুন্ধরা সম্মেলন (১৯৯২) ঃ রিও-ডি-জেনিরো

প্রকৃতপক্ষে স্টকহোম সম্মেলন ছিল পরিবেশ সমস্যা মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক উদ্যোগের প্রস্তুতিপর্ব। এর ঠিক কুড়ি বছর পরে বসেছে রিও সম্মেলন। মাঝের কুড়ি বছরে বিশ্বব্যাপী আলোচনা, তর্ক বির্তক কম হয়নি। পরিবেশবাদী বহু ধরনের ছোটো বড়ো বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। পরিবেশ সংরক্ষণে ভারতসহ অনেক রাষ্ট্রেই কিছু কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যেমন ভারতে তৈরি করা হয়েছে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ মন্ত্রক —কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় স্তরেই। কিন্তু সামগ্রিকভাবে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি পেলেও এবং কিছু সদর্থক পদক্ষেপ রাষ্ট্রীয় স্তরে গৃহীত হলেও পরিবেশ অবনমনকে বাঁধ দেওয়া যায়নি। ভারতে ভূপাল গ্যাস ট্র্যাজেডি, পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে চেরনোবিল পারমাণবিক চুল্লি দুর্ঘটনা বিশ্বজুড়ে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। পাশাপাশি উন্নয়ন ও পরিবেশ সমস্যার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ে পশ্চিমি শিল্পোন্নত দুনিয়ার সাথে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির তরজা নতুন করে জমে ওঠে বিশেষ করে বিশ্ব ব্যাংক, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রভৃতির আর্থিক পুনর্গঠন সংক্রান্ত বহুবিধ ফতোয়ায়। এই প্রেক্ষাপটে UNEP-র উদ্যোগে পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত Brunland রিপোর্ট নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন (Sustainable Development) এর ধারণাটিকে সামনে নিয়ে আসে। এই প্রতিবেদন উন্নয়নশীল দুনিয়ায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের অপরিহার্যতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেও উন্নয়নের সাবেকী ধারার পরিবেশ হানিকর বিষয়টির উপরও আলোকপাত করে। সামগ্রিক এই বাতাবরণে অনুষ্ঠিত হয়েছে রিওর বসুন্ধরা বৈঠক। রিও সম্মেলন স্টকহোমের মতো শান্তিপূর্ণ ছিল না। ঠান্ডাযুদ্ধে সদ্য বিজয়ী শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী পশ্চিমি দুনিয়া জগৎজোড়া আর্থিক জাল বিস্তারের দুর্বার বাসনায় নব উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ে। একাজে তাদের সবচেয়ে বড়ো সহায়ক হয় বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার আর বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা। কিন্তু এদিকে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি, ওজোন আচ্ছাদনের ছিদ্র দিয়ে অতিবেগুনি রশ্মির প্রবেশের শঙ্কা, ক্রমবর্ধমান অরণ্য সংহার হেতু বৃষ্টিপাত হ্রাসের সম্ভাবনা উন্নত দুনিয়াকেও তাড়া করে। এসবের ফলে শুধু যে পিছিয়ে থাকা অনুন্নত দেশগুলি বিপন্ন হবে তা নয়, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে তার উত্তাপ পোহাতে হবে উন্নত ধনিক বিশ্বকেও। সুতরাং পরিবেশ সংকট মোকাবিলায় জরুরি কিছু রক্ষাকবচ প্রয়োজন। রিও সম্মেলনে সেই সন্ধান প্রয়াস।

সম্মেলনের প্রস্তুতি চলেছে প্রায় দুই বছর ধরে। ১১৮ জন রাষ্ট্রপ্রধান সহ ১৭০টি দেশের সরকারি প্রতিনিধিরা এতে অংশ নেয়। প্রায় দেড় সহস্রাধিক এন.জি.ও বা বে-সরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়েছে। উপস্থিত ছিলেন

Scanned with CamScanner

৯ হাজারের মতো সাংবাদিক। সর্বার্থে আন্তর্জাতিক রাজসূয় যজ্ঞ। ১৯৯২ এর ৩ জুন থেকে ১৪ জুন ব্রাজিলের রাজধানী শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে বসুন্ধরা বৈঠক।

পরিবেশ ও উন্নয়ন প্রশ্নে স্টকহোমে দুই বিশ্বের, উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে যে বিরোধ প্রকাশ পেয়েছিল রিওতে তা চরমে পৌঁছায়। অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ কার্যত দুটি পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যেন ঠান্ডা যুদ্ধোত্তর বিশ্বে নতুন আরেক ধরনের ঠান্ডা যুদ্ধের সূচনা। শিল্পোন্নত দুনিয়া যথারীতি ওজোন স্তরের সংকট তাপমাত্রা বৃদ্ধির সমস্যা, অ্যাসিড বৃষ্টি, জনসংখ্যার বিস্ফোরণ, অরণ্য সংহার প্রভৃতির মোকাবিলার উপর গুরুত্ব আরোপ করে উন্নয়নশীল দেশগুলির উপর বহুবিধ বাধানিষেধ আরোপ করার প্রস্তাব নিয়ে আসে। পক্ষান্তরে দক্ষিণের দেশগুলি তাদের আর্থিক দুরবস্থায় পশ্চিমের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়। চলে প্রচন্ড চাপান উতোর।

অনেক রাজনৈতিক প্যাঁচ, দর কষাকষির পর শেষপর্যন্ত রিও সম্মেলন একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা গ্রহণ করতে সমর্থ হয় পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে। দুটি বড়ো সনদ বা দলিল গৃহীত হয়—একটি আবহাওয়া পরিবর্তন সংক্রান্ত এবং অন্যটি জীব বৈচিত্র্যের সংরক্ষণ সংক্রান্ত (Convention on Climate Change and Bio-diversity Protection)। পাশাপাশি সাংঠনিক স্তরে গড়ে তোলা হয় 'নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন' সংক্রান্ত রাষ্ট্রসংঘের একটি কমিশন (United Nations Commission on Sustainable Development) এবং বিশ্বব্যাংকের Global Environmental Facility (GEF) প্রজেক্ট। রিওর সবচেয়ে বড়ো অঙ্গীকার পত্রটি ছিল Agenda 21। এটি একটি সুবিশাল ও সুচিন্তিত দলিল যার মাধ্যমে পরিবেশ ও বাস্তুতান্ত্রিক ক্রমবর্ধমান ভারসাম্যহীনতার চিত্রটির পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণে অবশ্য করণীয় পদক্ষেপগুলি বর্ণিত হয়েছে। সমগ্র খসড়াপত্রটি 'নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন' ধারণার সাথে জড়িত।

রিও সম্মেলনে উন্মোচিত পরিবেশ রাজনীতির প্রকৃতিটি বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। দোয়েল ও ম্যাকাচেরনের মতে Agenda-21 এর স্বীকৃতিই প্রমাণ দেয় যে পরিবেশ সমস্যা আন্তর্জাতিক সমস্যা এবং যথার্থ আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রয়াস ছাড়া সেটির সুষ্ঠু মোকাবিলা সম্ভব নয়[৬]। অতীতে যে পশ্চিমি দুনিয়া মনে করত তৃতীয় বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধিই পরিবেশের পক্ষে সবচেয়ে বড়ো বিপদ এবং পিছিয়ে পড়া দেশগুলির দ্রুত আর্থিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তাকে তেমন পাত্তা দিতনা—রিওতে তারাই মেনে নিতে বাধ্য হয় যে গরিব দেশগুলির সামগ্রিক উন্নয়নের প্রশ্নটিকে সরিয়ে রেখে পরিবেশ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। ধনী দেশগুলির

Scanned with CamScanner

মদতপুষ্ট বহুজাতিক ব্যবসায়ী ও বাণিজ্যসংস্থাগুলিও রিওতে কোমর বেঁধে নেমেছিল। তাদের শঙ্কা ছিল রিওর এ্যাজেন্ডা ও গৃহীত প্রস্তাবনা যেন পরিবেশ বিপন্নতার নামে ব্যবসায়িক স্বার্থের পরিপন্থী না হয়। এর জন্য তারা বিশ্বব্যাংক, আই.এম.এফ-এর প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে। তবে রিওর কার্যবিধিতে রাজনীতির মাত্রা কতখানি চড়া সুরে ছিল সেটি বোঝা যায় যখন দেখা যায় যে প্রেসিডেন্ট বুশ (সিনিয়র) এর নেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত চুক্তিপত্রে সই করতে অস্বীকার করে। এ ছিল পরিবেশ স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো পরিবেশ বিপন্নকারী রাষ্ট্রের সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের নগ্ন প্রয়াস। ২০০৯-এ কানকুন সম্মেলন পর্যন্তও মার্কিন অবস্থানের পরিবর্তন হয়নি। পরিবেশ সংরক্ষণে ধনী শিল্পোন্নত বিশ্বের মেকি আন্তরিকতার এটি একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

রিও বোঝাপড়ার অন্যতম শর্ত ছিল এই যে পরিবেশ সংরক্ষণমূলক আন্তর্জাতিক পদক্ষেপগুলি কীভাবে ও কতখানি কার্যকরী হচ্ছে তা নির্দিষ্ট সময় অন্তরে খতিয়ে দেখা। রিওতে দুটি বড়ো উদ্যোগ ছিল 'নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন'কে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রসংঘের একগুচ্ছ পরিকল্পনা ঘোষণা এবং জলবায়ু ও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণমূলক সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলি গড়ে তোলা। প্রথমটি খতিয়ে দেখার জন্য রিওর ঠিক দশ বছর পরে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে বসে World Summit on Sustainable Development (WSSD) । পক্ষান্তরে, আবহাওয়া ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত খুব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয় ১৯৯৭ সালে জাপানের কিয়েটো শহরে যা কিয়েটো প্রোটোকল নামে বিখ্যাত।

ক্রমবর্ধমান বিশ্ব উষ্ণায়ন ঠেকাতে হলে বায়ুমন্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের ঘনত্ব কমানো জরুরি। এখন বাতাসে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ ৪,৮০০ কোটি টন কার্বন ডাই অক্সাইডের সমতুল্য। তাপমাত্রাকে সহনসীমার মধ্যে নামিয়ে আনতে হলে ২০২০ সালের মধ্যে ওই পরিমাণকে ৪,৪০০ কোটি টন স্তরে নামিয়ে আনতে হবে[৭]। উক্ত লক্ষ্য পূরণে প্রথমে মন্ট্রিল (১৯৮৭) এবং পরে রিও ও কিয়েটোতে সুনির্দিষ্ট কিছু বিধি প্রণয়ন করা হয়। শিল্পোন্নত দেশগুলি ব্যাপক শিল্পায়নের দ্বারা CFC গ্যাসের নির্গমনের মাধ্যমে গ্রিন হাউস সংকট ডেকে এনেছে। সেহেতু উক্ত গ্যাস নিঃসরণের মাত্রা কমিয়ে আনার ক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকাই সর্বাধিক। ১৯৯০ সালকে ভিত্তি ধরে কিয়োটোতে ঠিক হয় যে পশ্চিমি শিল্পোন্নত দুনিয়া বার্ষিক ৫.২ শতাংশ হারে গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণের মাত্রা কমিয়ে আনবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয় ৭ শতাংশ এবং ইউরোপীয় সংঘভুক্ত দেশগুলির জন্য ৮ শতাংশ। ২০১২ সালের মধ্যে এই লক্ষ্য পূরণের কথাও বলা হয়[৮]।

Scanned with CamScanner

উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমিয়ে আনা ও বিকল্প প্রযুক্তি ব্যবহার অত্যধিক ব্যয়বহুল হওয়ার সমস্যাকে মোকাবিলা করার জন্য একটা বিশেষ আন্তর্জাতিক তহবিল গড়ে তোলার সিদ্ধান্তও হয়।

কিন্তু কিয়েটো প্রোটোকলের উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্প অনেকটাই ভেস্তে যায় প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের নেতৃত্বাধীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেটি কার্যকর করতে অস্বীকার করায়। একথা অজানা নয় যে বাতাসে গ্রিনহাউস গ্যাসের ঘনত্ব বৃদ্ধিতে এককভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দায় সর্বাধিক। অথচ সেই দেশটির গররাজি হওয়ার অর্থই হল গ্রিন হাউস দূষণ সমস্যার থেকে পৃথিবীর মুক্তি না পাওয়া। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এখনও পর্যন্ত ১০৬টি রাষ্ট্র কিয়েটো প্রোটোকলের বাধ্যতামূলক প্রয়োগ শর্তাদি মেনে নিতে সম্মতি দিয়েছে। এর দ্বারা তারা প্রায় ৫৫ শতাংশ গ্লোবাল গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণের পথ উন্মুক্ত করেছে[৯]।

রিও-ডি-জেনিরো ও কিয়োটোর হাত ধরে বিশ্ব উষ্ণায়ন ঠেকাতে ও মানবপ্রজাতির ভবিষ্যৎ বিপন্নতাকে রোধ করার জন্য যে সার্বিক বোঝাপড়া ও ঐক্যমত গড়ে উঠেছিল তাকে ফলপ্রসূ করে তুলতে রাষ্ট্রসংঘ নতুন শতাব্দীতে একাধিক কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণে তৎপর হয়। এরই ফলশ্রুতিতে ২০০২ সালে জোহানেসবার্গ-এর নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলন, ২০০৭ সালে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বালি সম্মেলন, ২০০৯ সালে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন-এ The United Nations Climate Change Conference, ২০১০ সালে মেক্সিকোর কানকুন মহাসম্মেলন এবং ২০১২ এর শেষে দক্ষিণ আফ্রিকায় ডারবান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কিয়েটোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে চরম অসহযোগিতার বীজ বপন করেছিল, শেষপর্যন্ত কানকুন হয়ে ডারবানে এসে তার অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণে সমর্থ হয়েছে। প্রথম থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি লক্ষ্য—প্রথমত, CO_2 ও অন্যান্য গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ মাত্রা কমাতে চূড়ান্ত অনীহা। কারণ মার্কিন মতে এর ফলে তার শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দ্বিতীয়ত, দূষণ কমানোর আইনি বাধ্যবাধকতায় ভারত ও চিনের ন্যায় দ্রুত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কোনোরূপ ছাড় না দেওয়া। এই দুটি লক্ষ্য পূরণে অবশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা ধনিক বিশ্ব অনেকখানি সফল হয়েছে। প্রথমে কানকুনে ও পরে ডারবানে সিদ্ধান্ত হয়েছে দূষণ কমানোর আইনি বাধ্যবাধকতার বিষয়টি তুলে দেওয়ার। এর অর্থ কিয়েটোতে উন্নত ধনি দেশগুলির জন্য যে বাধ্যতামূলক দূষণ নিয়ন্ত্রণ মাত্রা নির্ধারিত হয়েছিল সেগুলি এখন যে কোনো রাষ্ট্র চাইলেই অগ্রাহ্য করতে পারবে। ডারবানের আগে কোপেনহেগেন সম্মেলনেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র,

Scanned with CamScanner

জাপান, কানাডা প্রভৃতি মহাশক্তিমান শিল্পোন্নত দেশগুলি বিশ্বের পিছিয়ে পড়া উন্নয়নশীল দেশগুলিকে দূষণমুক্ত জলবায়ুর পরিমন্ডল রক্ষায় আর্থিক ও প্রযুক্তিক সাহায্য দেওয়ার প্রশ্নটির সাথে এই বিষয়টিকে জুড়ে দিয়েছিল। উপরন্তু তারাই আন্তর্জাতিক 'সবুজ তহবিল' এর সাহায্য পেতে পারে যারা উন্নত বিশ্বের ন্যায় দূষণমাত্রা কমাতে তৎপর হবে। চিন ও ভারত প্রথমে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেও শেষ পর্যন্ত পশ্চিমি শক্তির চাপে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে।

এখন যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে প্রস্তাবিত ২০২০ সালের মধ্যে দূষণের মাত্রা কতখানি কমানো যাবে বলা কঠিন। একইভাবে বলা শক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ধনি দেশগুলি তাদের প্রতিশ্রুত বার্ষিক ১০০ মার্কিন বিলিয়ন ডলার দ্বারা 'Green Fund' আদৌ গড়ে তুলতে পারবে কিনা। পারুক না পারুক আজ এটাই সত্য যে দূষণ সৃষ্টিতে ঐতিহাসিকভাবে যাদের দায়িত্ব বেশি সেই শিল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহ দূষণরোধের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে আন্তরিকভাবে যত্নবান নয়। পরিবেশ রাজনীতির এ এক বিচিত্র খেলা।

Scanned with CamScanner